International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ইসলামী গণতন্ত্র ও প্রচলিত গণতন্ত্র: প্রেক্ষিত 24 এর জুলাই

Islamic Democracy and Conventional Democracy: The Perspective of July 2024

Dr. Mohammad Morshedul Hoque[1], Rahnuma Nasrin[2]

[1]Associate Professor, Department of Islamic Studies, University of Chittagong, Chattogram, Bangladesh.
[2]Ex-student, Dept. Of Islamic History & Culture, University of Chittagong, Chattogram, Bangladesh.

Abstract

Every freedom-loving person wishes to live independently and peacefully in their own country. No one wishes for political violence, chaos, or instability. Yet, leaders who are deeply entrenched in the greed for power often resort to unethical tactics to gain or cling to power, establishing a reign of terror and disorder across the nation. While the lack of accountability or the inaction of the judiciary is frequently cited as the primary cause, in truth, multiple factors are involved including moral decay and the prioritization of personal interests over national welfare. Although modern democracies claim to uphold the noble ideal that "there is no discrimination among people; all human beings are equal," in practice, most democratic states continue to be plagued by selfish pursuits of personal gain hidden behind the mask of power. As a result, despite the existence of policies and regulations on paper that are meant to serve public interest, citizens often receive no tangible benefits from the democratic process beyond the formal ritual of electing representatives at fixed intervals. In some cases, even the right to criticize or remove elected representatives for failing to uphold democratic ideals is taken away from the people. In contrast, the Islamic system of governance, especially during the era of the Rightly Guided Caliphs (Khulafāʾ al-Rāshidūn), was characterized by the full implementation of democratic values, including the public's right to critique their rulers. Consequently, the principles of Islamic democracy continue to stand as exemplary and worthy of emulation for all nations. The abandonment of these ideals has led to severe political instability in various countries. As a result, oppressed populations rise in protest against their rulers. The July Revolution of 2024 in Bangladesh was essentially a struggle of a deprived population demanding their rights. Years of deviation from democratic ideals by the ruling class including the suppression of freedom of speech and the closing of avenues for public criticism forced the oppressed people to break free from the chains of exploitation and take to the streets in protest. Eventually, the authoritarian government was compelled to relinquish power. Even though the downfall of the autocracy came through a mass uprising, the aspirations of the people remained unchanged. Once a population experiences the taste of empowerment, they yearn to relive it. The newly formed government, in turn, adopted people-centric and welfare-oriented measures to restore political stability by fulfilling public demands and ensuring just rights essentially reflecting the teachings of Islamic democracy. Therefore, following Islamic principles of governance could be an effective tool for establishing peace and outlining a true democratic framework — not just in Bangladesh, but in other parts of the world facing ongoing violence and political unrest.

প্রতিপাদ্যসার:

স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক মানুষ স্বদেশে স্বাধীনভাবে ও শান্তিতে বসবাস করতে চায়। রাজনৈতিক সহিংসতা,বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা কেউ কামনা করেনা। তথাপি ক্ষমতার লোভে আকণ্ঠ নিমজ্জিত নেতারা ক্ষমতা লাভ করতে অথবা লভ্য ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকতে নানা অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এক্ষেত্রে জবাবদিহিতার অভাব বা বিচার বিভাগের নিষ্ক্রিয়তাকে মূল কারণ হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হলেও মূলত নৈতিক অবক্ষয় ও ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষায় জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন সহ একাধিক কারণ এর সাথে জড়িত।" মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই,সকল মানুষই সমান"-এ মহান আদর্শকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রতিষ্ঠিত করার কথা প্রচলিত গণতন্ত্রে বলা হলেও মূলত অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ক্ষমতার আড়ালে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের হীন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ফলশ্রুতিতে কাগজে কলমে জনস্বার্থ সম্বলিত নীতিমালা বিধিবদ্ধ থাকলেও নির্দিষ্ট সময় পর জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্য কোন সুফল জনগণ ভোগ করতে পারেনা। এমনকি নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়িত না হওয়ার দরুণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার বা সমালোচনা করার অধিকারও ক্ষেত্রবিশেষে জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়।পক্ষান্তরে ইসলামী শাসনব্যবস্থায় সাধারণ জনগণ কর্তৃক শাসকদের সমালোচনা সহ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্যের বাস্তবায়ন ছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সাধারণ চিত্র।ফলশ্রুতিতে ইসলামী গণতন্ত্রের নীতিসমূহ আজও সকল রাষ্ট্রের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে আছে।এ আদর্শ হতে বিমুখ হওয়ার দরুণ বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করে।ফলে শোষিত জনগণ শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠে।২০২৪ এর জুলাই মাসে বাংলাদেশে সংঘটিত জুলাই বিপ্লব মূলত অধিকার বঞ্চিত জনগণের অধিকার আদায়ের লড়াই। দীর্ঘদিন যাবত গণতন্ত্রের আদর্শ হতে বিচ্যুত থাকা শাসকশ্রেণি কর্তৃক সমালোচনার দ্বার বন্ধ করে বাকস্বাধীনতার পথ রুদ্ধ করার দরুণ নিপীড়িত জনগণ শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং তাদের দাবি আদায়ে রাজপথে নেমে আসে। ফলশ্রুতিতে স্বৈরাচারী সরকার বাধ্য হয় ক্ষমতার গদি ছাড়তে। গণঅভ্যুত্থানের মুখে স্বৈরাচারের পতন হলেও জন আকাঙ্ক্ষার কোনো পরিবর্তন হয়নি। ফলে একবার অধিকার আদায়ে সচেষ্ট জনগণ বারবার সে স্বাদ আস্বাদন করতে উদগ্রীব হয়ে উঠে। নবগঠিত সরকারও জনগণের দাবি পূরণ ও ন্যায্য অধিকার প্রদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে গ্রহণ করে জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপ যা মূলত ইসলামি গণতন্ত্রেরই শিক্ষা। তাই বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চলমান সহিংসতা বন্ধে ও আদর্শ গণতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নে ইসলামী রাষ্ট্রনীতির অনুসরণই হতে পারে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যকরী হাতিয়ার।

Keywords: ইসলামী গণতন্ত্র (Islamic Democracy), প্রচলিত গণতন্ত্র (Conventional Democracy), 2024 এর জুলাই বিপ্লব (The July Revolution of 2024), গণতন্ত্রের স্বরূপ (The nature of democracy)।

ভূমিকা:

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إن الذين عند الله الاسلام

অর্থ: আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম (আল-কুরআন, ৩:১৯।

আল্লাহর মনোনীত এ জীবন ব্যবস্থা কেবল পূর্ণাঙ্গ নয় বরং সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, এতে সকল বিষয়ের নির্ভুল ও বাস্তবসম্মত সমাধান রয়েছে যা সর্বযুগে, সর্বাবস্থায় সকল দেশ ও জাতির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম-ই একমাত্র জীবনবিধান যা ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। ফলে এ জীবনব্যবস্থায় একজন সাধারণ মানুষ যেভাবে তার জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা খুঁজে পাবে একইভাবে একজন রাষ্ট্রপ্রধানও রাষ্ট্র পরিচালনার উত্তম সংবিধানের সন্ধান পাবে। আর এই সংবিধানের ধারা কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং জনকল্যাণকামী যেকোন রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য এটি একটি আদর্শ। কেননা, একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা-ই নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিত করে রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারে। এর প্রধান কারণ হলো, এ রাষ্ট্রব্যবস্থা ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যা গণতন্ত্রকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। যেখানে মুসলিম-অমুসলিম, আরব-অনারব, ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত সকলেই সমানাধিকার প্রাপ্ত। এ শাসনব্যবস্থায় আইনের চোখে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আশরাফ-আতরাফ, মুনিব-দাস, শাসক-শাসিতের মধ্যে বিভেদ করার সুযোগ নেই। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী আইনে নির্ধারিত শাস্তি হতে খোদ রাষ্ট্রপ্রধানের ছেলেকে ছাড় না দেয়ার দৃষ্টান্ত কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণিত

করে। পক্ষান্তরে, ইসলামী গণতন্ত্রের রূপরেখা ও দিকনির্দেশনার বিপরীতে মানবসৃষ্ট গণতন্ত্রের রূপরেখা ও স্বরূপ যে কতটা ত্রুটিপূর্ণ তা বর্তমান বিশ্বের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রচলিত অগণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচন, রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্যদের নিয়োগ, ক্ষমতাসীনদের একচ্ছত্র আধিপত্য, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগে ক্ষমতালিপ্সুদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সর্বোপরি হৃত গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নির্যাতিত জনগণের আন্দোলন ও বিভিন্ন দেশে সরকার পতনের ধারাবাহিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত। মানবসৃষ্ট গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এরূপ অধঃপতনের কারণ হলো, এর আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যাবলী কেবল কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ। প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা নেই বললেই চলে, যা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনের শাসনের যথাযথ প্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ সকলেই জবাবদিহি করতে ও বিচারের সম্মুখীন হতে বাধ্য। ফলে এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা ও শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পথকে তরান্বিত করে। তাই বর্তমান বিশ্বে সৃষ্ট অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা-ই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলমান রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও সম্প্রতি বাংলাদেশে সংঘটিত জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী অস্থিতিশীলতা দমনে ইসলামী রাষ্ট্রনীতির প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি:

ইসলামী গণতন্ত্র বনাম প্রচলিত গণতন্ত্র: প্রেক্ষিত ২৪ এর জুলাই অভ্যুত্থান' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বর্ণনামূলক বা পর্যালোচনা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, জার্নাল ও ইন্টারনেট হতে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ইসলামী রাষ্ট্রের যে সকল বৈশিষ্ট্য বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কট মোকাবেলায় সহায়ক হবে তা যুক্তি সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

গণতন্ত্রের পরিচয় ও উৎপত্তি:

গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy যা গ্রিক শব্দ Demo Kratia থেকে উদ্ভূত। গ্রীক Demokratia শব্দটি ' Demos' এবং ' Kratia' শব্দ দুটির সমন্বয়ে সৃষ্ট। ' Demos' শব্দের অর্থ হল 'জনগণ' এবং ' Kratia' শব্দের অর্থ হল 'শাসন ক্ষমতা'। সুতরাং, Democracy শব্দের অর্থ, জনগণের শাসন ক্ষমতা (হক, ২০১৯)।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রচলিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৬ তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। ১৮৬৩ সালের ১৯ শে নভেম্বর লিংকন তার দেয়া গেটিসবার্গ বক্তব্যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে 'Government of the people, by the people, for the people' যার অর্থ হলো-গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য (হক, ২০১৯)। অধ্যাপক গেটেলের মতে, যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগে অংশ নেওয়ার অধিকারী তাই গণতন্ত্র (সাদি, ২০১০)।

মূলত আধুনিক যুগে গণতন্ত্র বলতে এমন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ। গণতন্ত্র প্রথম উদ্ভাবিত হয় গ্রীসের এথেন্সে ৫০৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। আধুনিক যুগে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে সমগ্র বিশ্ব গণতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হলেও আদর্শ গণতন্ত্রের সকল বৈশিষ্ট্য এসকল দেশেও পরিলক্ষিত হয়না। কেননা গণতন্ত্র বলতে সমাজের একটি বড় অংশ আজও কেবল সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকেই বোঝানো হয়। অথচ গণতন্ত্রের সফলতার জন্য নাগরিকদের সুশিক্ষা, দক্ষ নেতৃত্ব, সহনশীলতা, আইনের শাসন, জবাবদিহিতা, বিচার বিভাগ, গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নাগরিকের অধিকার সুরক্ষা, জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি নিরপেক্ষ নির্বাচনের মতাই গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও এর উৎপত্তি:

সাধারণত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে মদিনায় মহানবী (দ:) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকে বুঝায় যেখানে ধর্মীয় আইন রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গৃহীত ছিল (খান ও রহমান, ২০১৬)। ইসলামী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বলতে জনগণের সার্বভৌমত্বকে বুঝায় না। বরং সার্বভৌম কর্তৃত্ব একমাত্র মহান আল্লাহর। আর এই সার্বভৌমত্ব বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব রয়েছে আল্লাহর প্রতিনিধি মানুষের ওপর। মানুষের রাজনৈতিক কর্মকান্ড আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সবার ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার সমানভাবে বিদ্যমান থাকবে। সেখানে বিধি মোতাবেক অমুসলিম প্রজাবর্গ ও জিম্মিদেরও অধিকার নিশ্চিত হয় (তাহের, ২০০৯)।

সুতরাং, এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে তার নির্দেশিত পন্থায় জনকল্যাণে পরিচালিত সরকার ব্যবস্থা-ই হলো গণতন্ত্র। এখানে রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনা করলেও তিনি মূলত জনগণের সেবক। তিনি তার সকল কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন এবং আইনের প্রতি সার্বিক অধীনতা স্বীকার করেন।এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান আইনের উর্ধ্বে নন। এমনকি জনস্বার্থ বিরোধী কাজের জন্য তিনি পার্থিব জীবনে বিচারের সম্মুখীন হবেন এবং পরকালে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হবেন। ইসলামী রাষ্ট্রে সকলে নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় সুবিধাদি ভোগ করে এবং মুসলমান-অমুসলমান সকলের নাগরিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে সকল ধর্ম বর্ণের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এটি একটি আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা। যার সূচনা হয় ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (দ) কর্তৃক রচিত মদিনা সনদে সকলের অধিকার সম্বলিত ধারা অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে।

ইসলামী গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য:

মদিনা সনদে বর্ণিত ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ ছিল জনস্বার্থ সম্বলিত। এ রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ (দ) কর্তৃক পরিচালিত। এর সকল নীতিমালা ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রের নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধকরণের মোক্ষম হাতিয়ার। মদিনা সনদের ধারাসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আদর্শ রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান ছিল। এ সংবিধানে মহানবি (দ) মদিনা রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল নাগরিকের সমানাধিকার নিশ্চিত করেন যা ইতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করে। রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণির নাগরিকদের সন্তুষ্টির উপর রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্ভর করে-এ পরম সত্য বিশ্ববাসীকে উপলব্ধি করানোর জন্য মহানবি হযরত মুহাম্মদ (দ)ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সমন্বয়ে এক অনন্য জাতি গঠন করেন যারা রাজনৈতিক দিক থেকে একই আইন মান্য করতে বাধ্য থাকলেও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ছিল স্ব স্ব ধর্ম পালনে স্বাধীন।কুরআনের ভিত্তিতে এ রাষ্ট্রের আইনকানুন প্রণীত হলেও অমুসলমানগণ স্ব স্ব সংস্কৃতির অবাধ অধিকার প্রাপ্ত হয়। আইনের চোখে সমতা, বাক স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতা, গঠনমূলক সমালোচনার দ্বার উন্মুক্তকরণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অমুসলমানদের জিজিয়ার বিনিময়ে নিরাপত্তা প্রদান, অপরাধীর শাস্তির বিধান অন্তর্ভুক্তি, প্রচলিত গোত্রভিত্তিক সমাজব্যবস্থার পুনর্বহাল, বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রাষ্ট্র রক্ষার্থে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতিগ্রহণ, রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তির বিধান আরোপ প্রভৃতি ছিল মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মহানবী (দ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত পদক্ষেপ:

মহানবী (দ) প্রবর্তিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ কেবল কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ ছিলো না। বরং দীর্ঘ ২৩ বছর যাবত রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি স্তরে তিনি এর বাস্তব প্রয়োগ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনগণও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলামী আদর্শালোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ফলশ্রুতিতে ইসলাম আরবের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে সমাদৃত হয় এবং ইসলামের সাম্য ও ন্যায়ের জ্যোতিতে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অত্যাচারী শাসকদের শোষণে নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত মানবসমাজ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। আর এরই মাধ্যমে মহানবি (দ) এর ইন্তেকালের এক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে তার সাম্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনুসৃত গণতন্ত্রের স্বরূপ নিম্নরূপ:

১) নির্বাচন পদ্ধতি:

মদিনা সনদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে মহানবি (দ) খোদ রাষ্ট্রনায়ক হলেও তিনি এ পদ জোরপূর্বক আদায় করেননি। বরং মদিনায় দীর্ঘদিন ধরে বিবাদে লিপ্ত আউস ও খাযরাজ গোত্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে হিজরতের পর তথায় শান্তি শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আনসার ও মুহাজিরগণ কর্তৃক নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। তাদের পক্ষ হতে অপরাপর জাতি বা গোত্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের যাবতীয় ক্ষমতা লাভ করেন। সে বলেই তিনি একজন নবি ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মদিনার সকল জাতি ও গোত্রের জন্য এ সনদ প্রণয়ন করেন এবং নিজ দায়িত্বে সকল নাগরিককে তা প্রদান করেন (খান ও রহমান,২০১৬)। এভাবে অপরাপর সকল ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর নির্দেশের প্রেক্ষিতে জনমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, আল্লাহর আইনের পরিপন্থী কোনো সিদ্ধান্ত কখনোই গৃহীত হতো না।

পরবর্তীকালে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে সকল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসৃত হয় এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে শুরুকরে হযরত আলী (রা) পর্যন্ত সকল খলিফাদের নির্বাচনে জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এমনকি তৃতীয় খলিফা নির্বাচনকালে সমযোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক সাহাবীর নাম প্রস্তাবিত হলে ভোট গ্রহণ করে হযরত উসমান (রা) কে নির্বাচিত করা হয়।

২) সমানাধিকার নিশ্চিত:

মদিনায় হিজরত করার পর মহানবী (দ) কর্তৃক গণতন্ত্রের আদর্শ কার্যকরভাবে প্রয়োগ হতে থাকে। এ সময় তিনি নিজ ধর্ম ও গোত্র ছাড়াও বিধর্মী (ইহুদি ও খ্রিস্টান) ও মদিনায় বসবাসরত বিভিন্ন গোত্রের সাথে সহাবস্থানের প্রেক্ষিতে সকলের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় তাদের সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান পূর্বক মদিনা সনদ প্রণয়ন করেন। এই সনদে ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (হাসান, ২০১৬)। এমনকি ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বিধর্মীদের গীর্জা ও মন্দির নির্মাণ করা হয় এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের নিজস্ব ধর্মীয় উৎসব ও রীতিনীতি পালনে অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে মহানবী (দ) খ্রিস্টানদের জান-মাল রক্ষা ও তাদের সাথে সহাবস্থানের নিমিত্তে তাদের স্বার্থ সম্বলিত কতিপয় নীতি প্রবর্তন করে ৬২৭ খ্রীস্টাব্দে একটি চার্টার প্রদান করে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন যা ইতিপূর্বে তাদের খ্রিস্টান শাসকবর্গ দেয়নি। এ প্রসঙ্গে সৈয়্যদ আমীর আলী বলেন, One of the blest monuments of enlightened tolerance that the history of the world can produce (আলী, ২০২৪).

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও সকল ধর্মাবলম্বীদের সমানাধিকার প্রদানের এ ধারা অব্যাহত থাকে। এমনকি মুসলিম প্রজাদের ন্যায় রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অমুসলমান প্রজাদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় যারা যৌবনে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় অবদান রেখেছিল। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) এর যুগে এ ধরণের এক ইহুদিকে তার বার্ধক্যের সময় ভিক্ষারত অবস্থায় দেখতে পেয়ে হযরত ওমর (রা) তার কাছে ভিক্ষা করার কারণ জানতে চাইলেন। ইহুদী ব্যক্তি তার দারিদ্র্যের কথা জানালে ওমর (রা) তাকে বাইতুল মালের সচিবের কাছে নিয়ে যান এবং আমৃত্যু মাসিক বৃত্তি নির্ধারণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, "এটা কখনোই সমীচীন হতে পারেনা যে, একজন অমুসলিম প্রজা যৌবনে জীবন দিয়ে আমাদের নিরাপত্তায় অবদান রাখবে, অথচ বার্ধক্যে আমরা তার জীবিকার ব্যবস্থা না করে তাকে অসহায় ছেড়ে দিবো (হুসাইন, ২০১৭)।"

খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর আমলে কিছু সংখ্যক মুসলমান একজন ইহুদীর জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি মসজিদটি ভেঙে ফেলার এবং উক্ত জমিখÐ ইহুদী মালিককে ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে লেবাননের একজন খৃস্টান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কারদাহী লিখেছেন যে, বায়তুল ইহুদী নামে ইহুদীর সেই বাড়ীটি এখনো বিদ্যমান রয়েছে (হামিদুল্লাহ,২০০৫)।

এছাড়াও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অসহায়দের জন্য প্রয়োজনানুসারে ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদা দামেস্ক সফরের সময় হযরত ওমর (রা) সেখানকার একটি গ্রামে কতিপয় খ্রিস্টান কুষ্ঠরোগীর কথা জানতে পেরে তাদেরকে যাকাতের তহবিল থেকে সাহায্য দান এবং তাদের জন্য রেশনে খাদ্য সরবরাহ করার নির্দেশ দেন। এভাবে মুসলিম শাসকদের অধীনে প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হতো (হুসাইন, ২০১৭)।

৩) রাষ্ট্রীয় সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার:

বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও রাষ্ট্রীয় সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহারের মাধ্যমে ন্যায় নীতি হতে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ ইসলামী আইনে নেই। এ নীতির বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় মহানবী (দ) সহ প্রত্যেক খলিফার জীবন পদ্ধতিতে।ইসলামী রাষ্ট্রের আয় হতে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য নির্ধারিত অংশ ব্যতীত অন্য কোন অংশে তাদের অধিকার ছিলোনা। বরং এক্ষেত্রে রাসূল (দ) গণীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তার প্রাপ্য অংশ রাষ্ট্রের মঙ্গলজনক কাজে ব্যয় করতেন (খান, ২০১৬)।

খোলাফায়ে রাশেদীনের ক্ষেত্রেও এ নীতির বিচ্যুতি ঘটেনি। উপরন্তু তারা বিভিন্ন সময় নিজেদের সম্পদ হতে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দান করতেন। এমনকি কখনো রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে তা জনগণের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করতেন। একবার হযরত ওমর (রা)'র চিকিৎসার জন্য মধুর প্রয়োজন হলে তার ব্যক্তিগত সংগ্রহে মধু না থাকায় তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সংরক্ষিত মধু ব্যবহার করেন। আর এ মধু

যেহেতু রাষ্ট্রীয় সম্পদ তাই তিনি তা ব্যবহারের পূর্বে জনগণের অনুমতি গ্রহণের জন্য অসুস্থাবস্থায় মসজিদে নববীতে যান। অতঃপর মুসলমানদের একত্রিত করে তাদের অনুমতি নিয়ে মধু সেবন করেন (হালিম, ২০১৭)।

৪) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "হে মুমিনগণ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদের যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে; সুবিচার করবে। এটাই তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা করো নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন (আল-কুরআন,৫:৮)।"

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবি (দ) থেকে শুরু করে প্রত্যেক সাহাবী কুরআনের অনুসরণ করতেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কুরআনে কোনো বিষয়ের সমাধান পাওয়া না গেলে তা হাদিস হতে, হাদিসে না পেলে ইজমার আদর্শ অনুসরণ এবং ইজমা দ্বারা নিষ্পত্তি করা না গেলে বিচারক নিজস্ব মতামত প্রয়োগ এবং জটিল বিষয় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতেন। এ ব্যাপারে মহানবী (দ) হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রা) কে ইয়েমেনের প্রশাসক নিয়োগকালে যে নির্দেশনা প্রদান করে গিয়েছেন তারই ভিত্তিতে হযরত ওমর (রা) বিখ্যাত কাজী শুরাইহ (রা) কে কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনার পরামর্শ দেন। ইজমা দ্বারা অনুরূপ ব্যাপারে নিষ্পত্তি না হয়ে থাকলে তিনি শুরাইহকে নিজ মত প্রয়োগ করার অধিকার প্রদান করেন। জটিল ব্যাপারগুলো নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করতে আদেশ দেন (খান, ২০১৬)। বিচার প্রক্রিয়া পরিচালনা, বিচারক নিয়োগ ও রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন করা হয়। উৎকোচ (ঘুষ) গ্রহণের মাধ্যমে বিচারকার্যে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গেলে বিচারককে বরখাস্ত করা সহ তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় হযরত ওমর (রা) এর পুত্র আবু শাহমাকে মদ্যপানের অপরাধে নিজ হাতে আশিটি বেত্রাঘাত করার ঘটনা আজও সমগ্র বিশ্ব শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

৫) স্বচ্ছ নিয়োগ পদ্ধতি:

মহানবী (দ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি পরিহার করে ন্যায়পরায়ণ, সৎ, কুরআন ও হাদিসে অভিজ্ঞ, উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা হতো। হযরত ওমর (রা) এর যুগে সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগের পূর্বে তাদের সম্পত্তির হিসাব নেয়া হতো। অতঃপর তাকে নিয়োগনামা প্রদান করা হতো। উক্ত নিয়োগনামায় উক্ত কর্মচারীর দায়িত্ব, কর্তব্য এবং ক্ষমতার পরিমাণ উল্লিখিত থাকত। খলিফার স্বাক্ষর ও সিলমোহরকৃত সেই নিযুক্তিপত্রে কয়েকজন গণ্যমান্য আনসার ও মুহাজির ব্যক্তি সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করতেন এবং মসজিদে সাধারণ সভায় নাগরিকদের সম্মুখে তা পাঠ করে শোনানো হতো। যেহেতু এ সময় ইসলামী রাষ্ট্রে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাই প্রশাসকগণ সকলেই নিয়মিত বেতনসহ রেশন পেত। বেতনের পরিমাণও ছিল উচ্চ। যাতে শাসকগণ খরচ যোগানোর জন্য রাষ্ট্রীয় কার্যের বাইরে অন্য কাজ না করে। কর্মচারীদের কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। অবৈধ উপায়ে ধন সংগ্রহ বা সঞ্চয়ের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল (খান, ২০১৬)।

৬) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:

মহানবী (দ) এর যুগ থেকেই বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতো। খলিফাদের যুগেও সে স্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র ছেদ পড়েনি। স্বয়ং খলিফাগণ প্রয়োজনে বিচারকের সম্মুখীন হতেন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কখনো কখনো বিচারকের রায় খলিফাদের বিপক্ষে যেতো। এক্ষেত্রে খলিফাগণ সে রায় নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিচারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এমনই এক বিচারে হযরত আলী (রা)'র বিপক্ষে রায় প্রদত্ত হয় যেখানে তিনি এক বেদুঈনের হাতে থাকা তরবারিকে তাঁর হারিয়ে যাওয়া তরবারি বলে দাবি করলেও প্রমাণ উপস্থাপন করতে না পারায় কাজী শুরাইহ উক্ত তরবারিটি বেদুঈনকে দিয়ে দেন। যদিও পরবর্তীতে উক্ত বেদুঈন তার ভুল স্বীকার করে এবং ন্যায়বিচারের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখে ইসলাম গ্রহণ করে (গণি, ২০২২)।

৭) বাক-স্বাধীনতা:

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বাক স্বাধীনতা। মানব ইতিহাসে বস্তুত ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষকে বাকস্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতা প্রদান

করে। প্রয়োজনবোধে একজন সাধারণ নাগরিকও প্রশাসকের সমালোচনা করতে পারত।তবে এই স্বাধীনতা আইন অমান্য আন্দোলনের ন্যায় ছিল না কিংবা কারো কুৎসা রটনার জন্যও উন্মুক্ত ছিল না। স্ব-স্ব অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে মদিনা রাষ্ট্রের যেকোনো নাগরিক স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে ও অপরের সমালোচনা করতে পারত। স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও স্বীয় বিবেকের প্রতি আস্থাই ছিল ইসলামি রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য (খান, ২০১৬)। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, উক্ত মত প্রকাশকে কোনো শাসক অপরাধ হিসেবে গণ্য করতেননা। বরং তাকে স্বাগত জানাতেন। হযরত ওমর (রা)'র শাসনামলে এক ব্যক্তি তাঁর সামনে গিয়ে রাগান্বিত হয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহকে ভয় করুন। উপস্থিত একজন বলল, তুমি কি আমীরুল মুমিনীনকে আল্লাহকে ভয় করতে বলছো? ওমর (রা) বললেন, তাকে বলতে দাও, সে যা বলছে তাতো ভালোই। তোমরা যদি এ কথা না বল তবে কোনো কল্যাণ হবে না। আর আমরাও যদি তা কবুল না করি তখনো কোনো কল্যাণ থাকবে না (হুসাইন,২০১৭)।

৮) পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা:

পরামর্শ সভা এবং খেলাফতকে ইসলামে অচ্ছেদ্য বলে মনে করা হয় (হাসান, ২০১৬)। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পবিত্র কুরআনে পরামর্শের ভিত্তিতে কার্য পরিচালনার নির্দেশনা রয়েছে। মহানবী (দ) এর যুগে অধিকাংশ সিদ্ধান্ত ঐশীবাণীর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত হলেও জনসাধারণের স্বার্থযুক্ত বিষয়গুলো তিনি পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন করতেননা। প্রাক ইসলামি যুগে প্রচলিত শূরা পদ্ধতি (পরামর্শের ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন) ও কুরআনের নির্দেশ অনুসারে রাসূল (দ) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদন করতেন (খান, ২০১৬)। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি সাধারণ সভা আহ্বান করতেন। যেমন বদর যুদ্ধের পূর্বে সাধারণ সভার আলোচনার ভিত্তিতে বদর প্রান্তরে সমবেত হওয়ার এবং উহুদ যুদ্ধের পূর্বেও অনুরূপ সাধারণ সভার আলোচনায় উহুদ প্রান্তরে যুদ্ধের স্থান নির্ণয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমনকি পরামর্শ সভার আলোচনায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হতো। যেমন উহুদ যুদ্ধে নগরের বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করার পক্ষে অধিকাংশ সদস্য মত প্রকাশ করায় সে মোতাবেক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় (প্রাগুক্ত)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির একক পরামর্শের ভিত্তিতে চূড়ান্তসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। যেমন মদিনা রাষ্ট্র প্রাচীর বেষ্টিত না হওয়ার দরুণ অরক্ষিত থাকায় খন্দকের যুদ্ধের সময় সালমান ফারসী(রা)'র পরামর্শে রাষ্ট্রের চতুর্দিকে পরিখা খনন করা হয়।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এ ব্যবস্থা আরো কার্যকরী হয়। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করলেও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজই করতেন না। মজলিস-উস সূরা প্রতিষ্ঠা করে তিনি ইসলামী গণতান্ত্রিক আদর্শের সূচনা করেন (গণি,২০২২)। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আলোচনা ছাড়া কোন সরকারি কাজ চলতে পারে না। কাদেসিয়ার যুদ্ধে সেনাপতি নির্বাচন, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের পর উক্ত অঞ্চলের কৃষি ভূমি বন্টন সহ সকল ক্ষেত্রে তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও পট পরিবর্তনের দরুন পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা কিছুটা স্থিমিত হয়ে পড়লেও ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব কখনোই হ্রাস পায়নি। ফলশ্রুতিতে উমাইয়া খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ও আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন সহ পরবর্তী আব্বাসীয় খলিফাগণ উক্ত পরামর্শ সভা পুনরায় চালু করেন (খান, ২০১৬)।

৯) উপদেষ্টা পরিষদ গঠন:

মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সকল কার্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত ছিল। এ সময় রাষ্ট্রীয় সমস্যাদির ব্যাপারে জনসাধারণ পরামর্শ দিতে পারত। মহানবি এবং তাঁর খালিফাগণ 'বিশেষ পরামর্শ সভা' এবং 'সাধারণ সভা' নামক দুটি পরিষদের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। মহানবি এবং খলিফাগণ দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজে কতিপয় বিশেষ সাহাবির পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু জটিল রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাধারণ সভা আহুত হতো। বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ছিল। বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত বিভক্ত হলে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত বলবৎ হতো (প্রাগুক্ত)। বয়োজ্যেষ্ঠ, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের সমন্বয়ে মজলিসে খাস বা বিশেষ সভা গঠিত হতো। উক্ত সভার সদস্যগণের সাথে পরামর্শ করে গঠনমূলক আলোচনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। ফলে মতানৈক্য বা বিরোধিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রে বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিত হয়।

১০) জবাবদিহিতা

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়নের অন্যতম রূপরেখা ছিল জবাবদিহিতা মূলক শাসন ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দায়বদ্ধ থাকতো একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বিচার বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ থাকতো। পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায় নীতি থেকে বিচ্যুত হলে পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে শাসকগণ সর্বদা ভীত থাকতেন। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, আল্লাহর সামনে একদিন হাজির হতে হবে এবং দৃঢ়ভাবে ছোট বড় সবকিছুর জবাব দিতে হবে (নদভী, ২০১৯)। জবাবদিহিতামূলক শাসন ব্যবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয় হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই জনগণের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণের মাধ্যমে। এতে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, "আমি আপনাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছি। তবে আমি আপনাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। আমি যদি ভাল কাজ করি, আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন। আর যদি আমি অন্যায় কাজ করি, আপনারা আমাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনবেন।" তিনি আরো বলেন, "যতক্ষণ আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করি ততক্ষণ আপনারা আমার আনুগত্য করবেন। আর যদি আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হই তাহলে আমার আনুগত্য করতে আপনারা বাধ্য নন (ইবনু কাসীর, ২০২২)।"

১১) সরকারী কর্মচারীদের সীমিত ভাতা নির্ধারণ:

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের ন্যায়সঙ্গত বেতন প্রদান করা হতো। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক দিরহামও তাদের নেয়ার অনুমতি ছিলোনা। এক্ষেত্রে কখনো কখনো কোনো কর্মকর্তা নিজের জন্য ভাতা হিসেবে নির্ধারিত অংশও গ্রহণ করতেন না। বরং তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দিতেন। খলিফার উদাহরণ ছিল এতিমের অভিভাবকের ন্যায়। তিনি আর্থিক সামর্থ্যের অধিকারী হলে সরকারী কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং বিরত থাকতেন। আর অভাবী হলে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে যতটুকু না হলে নয়-সে পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করতেন (নদভী,২০১৯)।

প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা) রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার খেলাফতকালে যে পরিমাণ ভাতা নিয়েছিলেন ইন্তেকালের আগে তা কোষাগারে ফেরত দিয়েছিলেন। অপরদিকে হযরত ওমর (রা) দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত থাকার পরেও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে নিজের জন্য কেবল দুটি কাপড়ই নিয়েছিলেন। এমনকি মুসলমানগণ তাঁর জন্য মাসিক বেতন নির্ধারণ করতে চাইলে তিনি বলেন এই দুটি কাপড় ব্যতীত অন্য কিছুই তার জন্য বৈধ নয়। তিনি আরো বলেন, 'আমার ভরণপোষণ, আমার খাদ্য আমার পরিবারের ভরণপোষণ অন্য কোরাইশী লোকদের মতই। আমি তাদের থেকে গরীবও নই আবার ধনী ও নই। আর আমি তো মুসলমানদেরই একজন (হুসাইন,২০১৭)। যদিও অন্যান্য সাহাবীদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে খাদ্য ও পোশাক সংগ্রহ করতে পারেন এমন পরিমাণ ভাতা বায়তুল মাল হতে গ্রহণ করেন এ শর্তে যে, স্বচ্ছল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা নেয়া বন্ধ করে দিবেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ না করার অন্যতম কারণ ছিল এই যে, প্রত্যেক খলিফা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সংরক্ষিত অর্থকে জনগণের আমানত মনে করতেন। আর এতে প্রত্যেকেরই সমান হক রয়েছে। তাই ওমর (রা) সরকারি দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মচারীদের কেও বিলাস ও স্বাদ আস্বাদন হতে বিরত থাকার জন্য কড়া নির্দেশ দিতেন। কেননা তাদের সামান্য ভুল ত্রুটি সমগ্র মুসলিম জনতার চরিত্রে দুর্নীতির বীজ বপন করার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে (প্রাগুক্ত)।

১২) প্রতিহিংসা মূলক আচরণ পরিহার:

ইসলাম শান্তি ও ন্যায়ের ধর্ম। আর শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে, শাসক কর্তৃক শাসিতদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করা। এ আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায় মহানবী (দ) সহ খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে। দীর্ঘদিন যাবত নিজ মাতৃভূমিতে নির্যাতনের শিকার হয়ে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় হিজরত করে মহানবী (দ) একটি আদর্শ রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপন করেন।এর ১০ বছর পর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা বিজয়ের দিন বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করেন। এসময় তিনি অত্যাচারী কুরাইশ কাফিরদের শাস্তি দেয়ার পূর্ণ সুযোগ পেয়েও তা কাজে লাগাননি।বরং সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মানব ইতিহাসে এক অনন্য নজির স্থাপন করেন। শত্রুকে হাতের কাছে পেয়েও প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আঘাত না করে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের ফলে তারা তাঁর মহানুভবতায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষিত হয় ও ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

১৩) গঠনমূলক সমালোচনা:

রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ সাধনই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে যে কোন পরামর্শ যেমন গ্রহণ করা হতো তেমনি অন্যায় প্রতিরোধে শাসকের সমালোচনাকেও সমর্থন করা হতো। ফলে জনগণ নির্দ্বিধায় সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারতো। এমনকি প্রয়োজনে খোদ রাষ্ট্রপ্রধানের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে মত প্রদান করা হতো। যেমন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)'র যুগে দুইজন সাহাবী আকরা ইবনে হারেছ এবং উয়াইনা ইবনে হাছান (রা) নিজেদের অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা বলে সরকারী কিছু খাস জমি তাদের জন্য বরাদ্দের আবেদন করলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের ফরমান লিখে দিলেন এবং সেই ফরমানে উপস্থিত সাহাবাদের সাক্ষ্য দস্তখত রাখা হলো। সে সময় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তাই সে দুজন সাহাবী ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর স্বাক্ষর নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আসার পর দলিল দুটি তাঁর সামনে দেওয়া হলে তিনি তা পাঠ করার সাথে সাথে ছিঁড়ে ফেলেন। এতে উভয় সাহাবী ভীষণ রাগান্বিত হয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছে নালিশ করলেন। খলিফার দরবারে এ বিষয়ে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি হলে হযরত ওমর রাঃ বললেন, 'খাস জমির মালিক সকল মুসলমান। সেখান থেকে কিসের ভিত্তিতে তাদের দান হিসেবে দেওয়া হবে?' খলিফার সামনে হযরত ওমর রাঃ এই ব্যাখ্যা দিলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার পূর্বের সিদ্ধান্ত বাতিল করলেন। এক্ষেত্রে তিনি আত্মম্ভরিতার পরিবর্তে সত্য ও ন্যায় এর প্রতি আনুগত্য দেখালেন। কারণ হযরত ওমর রাঃ এর যুক্তি এবং বক্তব্য ছিল সত্যের অধিক নিকটবর্তী। আর খলিফা সে সময় নিজের মর্যাদা সত্তে¡ও নিজেকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করতেন না। সাধারণ নাগরিকের মত খলিফাকে নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হত (হুসাইন, ২০১৭)। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক খলিফার সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করা ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক নিজের সিদ্ধান্ত বাতিল করা ছিল আদর্শ গণতন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৪) নেতার আনুগত্য:

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায়সঙ্গত নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সকল কর্মকর্তার জন্য আবশ্যক। এতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের পাশাপাশি প্রয়োজনে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কঠিন পরিস্থিতি সহজে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। ফলে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজ হয়। হযরত ওমর (রা) বলেন, আনুগত্যের মাধ্যমেই রাষ্ট্র বা সংগঠন টিকে থাকে। আনুগত্য ছাড়া এর অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়না (হুসাইন, ২০১৭। তাই ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় খলিফা নির্বাচনের পরপরই সকল নাগরিক তাঁর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেন এবং প্রত্যেক কর্মকর্তা নিজেদের স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। এমনকি প্রয়োজনে পদত্যাগ করতেও দ্বিধাবোধ করতেননা। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) খেলাফতের দায়িত্ব পালনকালে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কে আদেশ দিয়েছিলেন তিনি যেন ইরাক থেকে মদীনায় ফিরে আসেন। ইরাকের লোকেরা আবদুল্লাহর রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহুর কাছ থেকে উপকৃত হতো এবং তাকে ভালোবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো। তাই তারা আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে বললো, তিনি যেনো খলীফা ওসমানের আদেশ উপেক্ষা করেন। এতে যতো রকম সমস্যা দেখা দেবে তা সমাধানে তারা নিজেদের বুক পেতে দেবে। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহ তা'য়ালা আনহু বললেন, যিনি আদেশ দিয়েছেন তার আনুগত্যের রশি আমার গলায় বাঁধা। আমি চাই না আমার মাধ্যমে কোনো ফেতনা-ফাসাদের দ্বার উন্মোচিত হোক (হুসাইন, ২০১৭)।

১৫) জনস্বার্থ সংরক্ষণ:

ইসলামী রাষ্ট্রে শাসক হলো জনগণের সেবক। তিনি জনকল্যাণ ও জনস্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট থাকবেন। জনগণের অধিকার সংরক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে প্রয়োজনে পদত্যাগ করা তার জন্য আবশ্যক। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যেক শাসক এ সকল বিষয়াদি মাথায় রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। মহানবি (দ) মদিনায় প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রে জনস্বার্থ রক্ষায় যে উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন কালক্রমে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তা আরো কার্যকরভাবে প্রয়োগ হতে থাকে। হযরত ওমর (রা)'র দীর্ঘ ১০ বছরের শাসনামলে ইসলামী সাম্রাজ্য একটি সুষ্ঠু জনকল্যানমুখী শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়। তিনি জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এবং প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করার জন্য রাতের অন্ধকারে মদিনার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো কখনো তাদের প্রয়োজন পূরণে নিজেই তাদের গৃহে উপস্থিত হতেন। এমনকি সেবাপ্রদানে ত্রুটি হলে বা নিজে কোনো ভুল করলে আল্লাহ ও মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতেন। তিনি নিজে যেভাবে জনগণের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন তেমনি প্রাদেশিক

শাসনকর্তাদের এ বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করতেন। দায়িত্ব পালনে সামান্যতম অবহেলার প্রমাণ পেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। হযরত ওমর (রা) এর শাসনামলে শোরাইক ইবনে শামি নামে মিশরের এক সামরিক অফিসার কৃষি কাজের অনুমতি চাইলে খলিফা তা নাকচ করে দেন। তথাপি তিনি মিশরে কৃষি কাজ শুরু করলে হযরত ওমর (রা) মিশরের গভর্ণরকে এ মর্মে চিঠি দেন যে, তিনি যেন শোরাইক কে মদিনায় পাঠান। শোরাইক মদিনায় আসলে খলিফা তাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। ফলে তিনি খলিফার কাছে ক্ষমা চান এবং তওবা করেন। তার তওবার স্বীকৃতি সাপেক্ষে তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন এবং ভবিষ্যতে সরকারী দায়িত্ব পালনকালে জনগণের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ প্রদান করে বলেন, "যাও, তুমি মিশরে ফিরে যাও, নিজের সরকারী দায়িত্ব পালন করো (হুসাইন, ২০১৭)।"এভাবে অর্পিত দায়িত্বের প্রতি অবহেলার মাধ্যমে জনগণের অধিকার ক্ষুন্ন করার সামান্যতম চেষ্টাকে প্রতিহত করার পাশাপাশি জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তিনি সরকারি ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে আদমশুমারি প্রবর্তন, সুষ্ঠু রাজস্বব্যবস্থার প্রচলন, পুলিশ বাহিনী ও বিভিন্ন দফতর প্রতিষ্ঠা, নারীশিক্ষার প্রসার সহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার এ জনকল্যানমুখী শাসনব্যবস্থা পরবর্তী যুগে বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে থাকে। আজও খলিফা ওমর (রা) প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা বিশ্ব গণতন্ত্রের জয়গান করছে।

প্রচলিত গণতন্ত্র:

আধুনিক যুগে সর্বাধিক জনপ্রিয় সরকার ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের নাম উচ্চারিত হলেও প্রকৃত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও দৃষ্ট হয়না। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব এর মাধ্যমে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎসে পরিণত করতে রাজতন্ত্রের বিপরীতে রিপাবলিক যুগের সূচনা হয়। যা গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির পথকে সুগম করে। তথাপি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার ২৩২ বছর পরও প্রকৃত গণতন্ত্রের পরিবর্তে ব্যক্তির অধীন ভুয়া গণতন্ত্র অনুসারেই অধিকাংশ দেশ পরিচালিত হচ্ছে। অনেক দেশে তা প্রকাশ্য স্বৈরতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করেছে। ফলে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা মূলত গণতন্ত্রের মুখোশে স্বৈরতন্ত্র। এ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান প্রচলিত থাকলেও তা কার্যকরী নয়। উদাহরণস্বরূপ এ ব্যবস্থায় নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও তা মূলত ক্ষমতাসীন সরকারকে আইনি বৈধতা দেয়ার আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এতে জনগণের আশা আকাক্সক্ষার প্রতিফলন ঘটে না। আর এ ব্যবস্থাকেই গবেষকগণ ভুয়া গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেন। ভুয়া গণতন্ত্রে যাঁরা ক্ষমতায় থাকেন, তাঁরা সংবিধান ব্যবহার করেন নিজেদের সুবিধামতো; নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে সংবিধানকে ঘষামাজা, কাটাছেঁড়া করতে দ্বিধান্বিত হন না (রীয়াজ, ২০২৫)।

প্রচলিত ভুয়া গণতন্ত্রের ত্রুটি:

প্রচলিত ভুয়া গণতন্ত্র ধীরে ধীরে স্বৈরতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করে। এমনকি একপর্যায়ে তা রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে করায়ত্ত করে আইনের শাসনকে অকার্যকর করে তোলে।ফলে এ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের আশা-আকাক্সক্ষা প্রতিফলিত হয় না এবং ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজ করে। রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা শুধুমাত্র উক্ত দলের সমর্থক কতিপয় গোষ্ঠী শতভাগ ভোগ করে। এতে করে সুবিধাবঞ্চিত জনগণ একপর্যায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং কখনো কখনো রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে ওঠে। তবে এ প্রক্রিয়া একদিনে সম্পন্ন হয় না। বরং দীর্ঘদিনের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম ও জনগণের নিষ্ক্রিয়তা প্রথমে সক্রিয় গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণ এবং সর্বশেষ এর চূড়ান্ত পতন ঘটায়। আর গণতন্ত্রের এই পশ্চাদপসারণ কয়েকটি ধাপে ঘটে বলে বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো, ক্ষমতা সংহত করা ও শাসনব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন, প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্য নষ্ট করা, নির্বাহী ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ ও রাজনীতি করণ, তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে গণপরিষদের অবক্ষয় এবং কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দমন বা দূর করে নির্বাচনী কারসাজি (রীয়াজ, ২০২৫)। গণতন্ত্রের পশ্চাদপসরণের উল্লেখিত পথ অনুসরণ করে বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে স্বৈরতন্ত্র আইনগত বৈধতা লাভ করেছে।

ইসলামী গণতন্ত্র ও প্রচলিত গণতন্ত্রের তুলনামূলক পর্যালোচনা:

- ইসলামী গণতন্ত্র ও প্রচলিত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একাধিক সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলেও আদর্শগত ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। উভয় গণতন্ত্রে সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, বাক-স্বাধীনতা, নিরঙ্কুশ নির্বাচন ব্যবস্থা, জনমত গ্রহণ, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সাম্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ, সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দান, নৈতিকতার উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিধিবদ্ধ থাকলেও প্রচলিত গণতন্ত্রে এ সকল নীতি বহুলাংশে অনুসৃত হয়না। পক্ষান্তরে, ইসলামী গণতন্ত্রে আদর্শ রাষ্ট্রের সকল বৈশিষ্ট্য শতভাগ অনুসৃত হতো। এ গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় গুণ হলো, জনস্বার্থ

সংরক্ষণে যে কোন ধরণের পদক্ষেপ গৃহীত হতো। অপরদিকে প্রচলিত গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়। ফলে ক্ষমতায় টিকে থাকার মানসে যেকোন ধরণের অপকর্ম এ গণতন্ত্রে অন্যায়ভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে। এমনকি ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যত নির্দিষ্ট কোনো দলের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

- প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম দূর্বলতা হলো বিরোধী দলের অস্তিত্ব, যা ইসলামী গণতন্ত্রে অনুপস্থিত। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের অস্তিত্বকে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার অব্যর্থ হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হলেও মূলত সরকারি দলের সাথে বিরোধী দলের বিরোধীতা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে ইসলামী গণতন্ত্রে বিরোধী দলের পরিবর্তে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হতো। যেমন, হযরত আবু বকর (রা)' যুগে ওমর (রা) ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। আবার উমর (রা)'র যুগে আলী (রা) ছিলেন প্রধান বিচারক। এভাবে অন্যান্য খলিফার যুগেও এ প্রথা চালু ছিল। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা রাষ্ট্রপ্রধানকে বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদানের পাশাপাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করে গঠনমূলক সমালোচনা করতেন। এ ধরণের পরামর্শ ও গঠনমূলক সমালোচনার ফলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন তরান্বিত হতো।
- ইসলামী গণতন্ত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য যা আধুনিক বিশ্বের গণতন্ত্রে অনুপস্থিত তা হলো, জবাবদিহিতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। ইসলামী রাষ্ট্রে জবাবদিহিতার ভয়ে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যেমন দুর্নীতি করতে পারতোনা একইভাবে বিচার বিভাগের সক্রিয়তার দরুণ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির তিল পরিমাণ অন্যায়ভাবে গ্রাস করতে পারতোনা। অপরদিকে সরকারী কর্মচারীদের স্বল্প বেতনের দরুণ তারা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার অপচেষ্টা করতোনা। আবার অতিরিক্ত বেতন গ্রহণকেও নিজেদের জন্য বৈধ মনে করতোনা। তারা রাষ্ট্রীয় পদবীকে জনসাধারণের সেবা করার মোক্ষম সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতো এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করে যেতো। এমনকি কোনো স্থানে নিযুক্ত কর্মচারী যাতে দুর্নীতিপরায়ণ হতে না পারে সেজন্য গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে সকল এলাকার কার্যাবলী তদারক করতো। পক্ষান্তরে প্রচলিত গণতন্ত্রে দলীয়করণের প্রভাব আইন প্রয়োগকারী কারী বিভাগ সমূহেও বিস্তার লাভ করে। এক্ষেত্রে অনেক সময় এসব প্রতিষ্ঠানে দলীয় লোকদের উচ্চপদে নিয়োগ দেয়ার ফলে কার্যত প্রতিষ্ঠান দলের অধীন হয়ে পড়ে। ফলে দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে এবং ক্ষমতাসীন ব্যাক্তিরা থাকে বিচারের উর্ধ্বে। অপরদিকে সরকারী বেতন ও সুবিধাদি তাদের ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।
- ইসলামী গণতন্ত্রে বাক স্বাধীনতা ও জনমত প্রকাশের চর্চা প্রচলিত গণতন্ত্রে অনুপস্থিত। প্রচলিত গণতন্ত্রে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের অস্তিত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হলেও কার্যত জনমত প্রকাশের অধিকার হরণ করার মাধ্যমে গণতন্ত্রের কবর রচিত হয়। বাক স্বাধীনতা হরণের উদাহরণ হিসেবে সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা, হলুদ সাংবাদিকতার অবাধ প্রচলন, বিরোধী বক্তব্য প্রদানকারীদের আটক ও নির্জাতন সহ নানাভাবে হয়রানি করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এমনকি কোনো কোনো দেশে প্রকৃত ইতিহাস সম্বলিত বই বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করে তা বাজেয়াপ্ত করার নজিরও রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী গণতন্ত্রে জনসম্মুখে সরকারের সমালোচনা করার ও সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের দৃষ্টান্ত রয়েছে।
- ইসলামী গণতন্ত্রে ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে খোদ রাষ্ট্রপ্রধানকে বিচারকের সামনে হাজির হওয়া প্রচলিতগণতন্ত্রে কল্পনাতীত। কেননা, প্রচলিত গণতন্ত্রে স্বয়ং বিচারকই কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। আবার কখনো তিনি দলীয় নিয়োগে ক্ষমতাসীন হন। তবে এ ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ অকার্যকর হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক দেশের সকল প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগতকরণ।
- ইসলামী গণতন্ত্রের সাথে প্রচলিত গণতন্ত্রের বিরাট তফাৎ লক্ষ্য করা যায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। ইসলামী শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের আমানত বিধায় তা অন্যায়ভাবে গ্রাস করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পদকে বক্তিগত সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন সরকার প্রধানের পারিবারিক সদস্যদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ ও নামে বেনামে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পদের সিংহভাগ ভোগ ও ক্ষেত্রবিশেষে পাচার করা হয়।
- ইসলামী গণতন্ত্রে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিচক্ষণতা ইত্যাদি বিবেচ্য বিষয়। এমনকি নিয়োগ প্রদানের পূর্বে ব্যক্তিগত সম্পদের হিসাব সংরক্ষণ সহ দায়িত্বে ইস্তফা দানকালে সম্পদের পরিমাণের হিসাব সংগ্রহ করা হতো। পক্ষান্তরে প্রচলিত ব্যবস্থায় নিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা, স্বজনপ্রীতি, দলীয় প্রভাব ইত্যাদির ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়।
- সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ ইসলামী শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে ইসলাম ভিন্ন ধর্ম ও ভিন্ন জাতির অধিকার রক্ষায় সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে যা মান্য করতে রাষ্ট্রপ্রধান বাধ্য ছিলেন। মদিনায় রাসুল (দ.) রাজনৈতিক যে স্বতন্ত্র মডেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা

আজ অবধি সকল মুসলিম সরকারের কাছে মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে মদিনা রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যেভাবে সম্মান ও নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে, তার দ্বিতীয় কোনো নজির বিশ্বের ইতিহাসে আজ অবধি দেখা যায় না (খতিব, ২০২১)। পক্ষান্তরে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়া সত্তে¡ও বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংখ্যালঘুদের নির্যাতন একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। চীনের উইঘুর মুসলমানদের নির্যাতন, মায়ানমারে রোহিঙ্গা নিধন, ভারতে মুসলিম নির্যাতন ও মুসলমানদের ধর্মীয় স্থাপনায় হামলা ও ভাংচুর ইত্যাদি সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণের নিকৃষ্ট উদাহরণ।

- প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনকে গণতন্ত্রের প্রধান শর্ত হিসেবে বিবেচনা করে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণে রাজনৈতিক দলগুলোর আপ্রাণ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় যা তাদের ক্ষমতালিপ্সার বহিঃপ্রকাশ। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হওয়ার অর্থ জনগণের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেয়া যা আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত। আর এ গুরু দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হওয়া মানে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করা ও বিচারের সম্মুখীন হওয়া। এজন্যই সাহাবীরা হুকুমতের পদসমূহের ওপর পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত না: বরং তারা এসব গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করত এবং এর জিম্মাদারি তাদের শঙ্কিত করে তুলত। তাদের প্রত্যেকেই পিছু হটত এবং নিজেকে এই বোঝা-বহনের অনুপযুক্ত মনে করত। এরপরও যখন তারা কোনো জিম্মাদারি নিজের হাতে তুলে নিত, তখন তাকে লুটের মাল ভাৰত না এবং তা গ্রাস করার জন্য এগিয়ে যেত না; বরং একে নিজের জিম্মায় অর্পিত এক পবিত্র আমানত ও আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ মনে করত (রীয়াজ, ২০২৫)। তারা পদের প্রতি নির্লোভ ছিল আর ইসলামও পদের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিকে তা সমর্পণ করতোনা। অপরদিকে প্রচলিত গণতন্ত্রে ক্ষমতালিপ্সুরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচনে দাঁড়ায় এবং ক্ষমতা লাভে মরিয়া হয়ে উঠে।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও ২৪'র অভ্যুত্থান:

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ৭২ এর সংবিধানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে সাংবিধানিক ভাবে পরিচিতি লাভ করলেও প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশে গণতন্ত্র সর্বকালেই উপেক্ষিত হয়েছে। মূলত স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদের (স্বৈরতন্ত্র) মধ্যে পেন্ডুলামের মতো ঝুলেছে বললে অতিরঞ্জন হবেনা (রীয়াজ, ২০২৫)। এ দোলাচলের বিবেচনায় বাংলাদেশে ১৯৭১-১৯৭৫ পর্যন্ত স্বৈরতন্ত্র, ১৯৭৫-১৯৯০ পর্যন্ত সেনাশাসন ও ১৯৯০-২০০৬ এবং ২০০৬-২০২৪ পর্যন্ত দুই মেয়াদে নির্বাচিত বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গণতান্ত্রিক শাসন চালু থাকলেও তখনো তা থেকেছে দূর্বল ও ভঙ্গুর। কেননা গণতন্ত্রের কিছু মৌলিক বিষয়, বিশেষত নির্বাচন ছাড়া আর সব জবাবদিহির প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি, নাগরিকদের অধিকার সীমিতকরণ এবং রাষ্ট্রের তিন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন না থাকা গণতন্ত্রকে দূর্বল করে দিয়েছে। নির্বাচিত বেসামরিক সরকারের আমলে গণতন্ত্রচর্চার লক্ষণগুলো কিঞ্চিৎ পরিমাণে দেখা গেলেও একাধিক বার ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের উত্থান হয়েছে এ বেসামরিক সরকারের আমলেই (রীয়াজ, ২০২৫)। কেননা, এ সময় নির্বাচন হলেও এতে একাধিকবার কারচুপি ও ভোট জালিয়াতি হয়। ফলে অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকার বারবার ক্ষমতা লাভের সুযোগ পেয়ে একসময় স্বৈরতন্ত্রের রূপ নেয়। দীর্ঘদিন যাবত জনগণের নিষ্ক্রিয়তা, সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ, বিরোধী দলের উপর হামলা, বিচার বিভাগের নির্লিপ্ততা এ স্বৈরশাসনের পথকে সুগম করে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরে "World Report 2020: Rights Trends in Bangladesh" এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়,

"After the 2018 elections were held, reports of vote rigging emerged which sparked protests by the Left Democratic Alliance. However, cases of police brutality and assaults on protesters were seen, as at least 50 activists were left with serious injuries. In September 2018, the Bangladeshi government introduced the Digital Security Act. However, some laws in the act criminalised the freedom of expression as several cases of civilians being charged were revealed for posting anti-government comments online (wikipedia , World Report 2020: Rights Trends in Bangladesh)"

অপরদিকে Amnesty International এ "Caught Between Fear and Repression" শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টে বাংলাদেশে স্বাধীন সাংবাদিকতার ক্রমাবনতির তথ্য উঠে এসেছে। এতে বলা হয়,

Journalism in Bangladesh has been under immense pressure as evident in the rankings of the country in the World Press Freedom Index. Bangladesh stood at 144 out of 180 countries in 2016, and the rankings only slipped as Bangladesh received 146 in 2018, 150 in 2019, and 151 in 2019. Amnesty International

reported that the main hindrance to free journalism is that several media outlets in Bangladesh are affected by owners and political influence, which hinders the diversification of opinions. In 2016, some reporters argued that Bangladesh's press freedom had never been more restricted since the country's return to civilian rule in 1991. Amnesty International also revealed that the press is often intimidated by threats of physical violence and criminal cases against journalists (Wikipedia, Caught Between Fear and Repression, 2018).

এছাড়াও বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড এবং হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর রূপ নেয়। ২০০৯ সালে আনুমানিক ১৫৪টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও ২০১০ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের মাধ্যমেআরও ১২৭টি মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছিল (সাউথ এশিয়া জার্নাল, ২০১১)।

এভাবে দীর্ঘদিন যাবত অত্যাচারিত ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে বাংলাদেশের জনগণ ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং এরই ফলশ্রুতিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ৫ ই আগস্ট ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৭বছরের স্বৈরশাসনের পতন ঘটায়। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বার স্বাধীনতা লাভ করলেও প্রকৃত গণতন্ত্র চর্চা ও নাগরিক অধিকার ভোগ করার স্বাদ এখনো অধরা। কেননা অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষমতাচ্যুত গোষ্ঠী দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে মরিয়া হয়ে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই সহ নানা অপকর্ম দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অপরদিকে দীর্ঘদিন যাবত শোষণের শিকার হওয়া জনগণ ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে অত্যাচারী শাসকের আস্তানা ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে ইসলামী শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা:

বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে (বিশেষত সিরিয়া, মিশর, তিউনিসিয়া ইত্যাদি) ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বৈরতন্ত্রের পতনে গণঅভ্যুত্থান সফল ভূমিকা পালন করলেও অভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দমন ও জনআকাঙ্ক্ষার প্রতি সজাগ থেকে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইসলামী শাসনব্যবস্থার অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য। কেননা একমাত্র ইসলামি শাসনব্যবস্থার অনুসরণে বিদ্যমান অরাজকতা, অস্থিতিশীলতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, অন্যায় আচরণ, দুর্নীতি, ধর্ষণ, রাহাজানি, ডাকাতি, হত্যা ইত্যাদির অবসান ঘটতে পারে। এ শাসনব্যবস্থায় সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়াজনীয় দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান অরাজক পরিস্থিতি দমনে ইসলামী বিধি মোতাবেক শাসক নিয়োগ, কর্মচারীদের নির্ধারিত বেতন প্রদান, আইন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, শাসক-শাসিত উভয়ের ক্ষেত্রে আইন কার্যকরভাগে প্রয়োগ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, জনমত প্রকাশের স্বাধীনতা, প্রতিহিংসার রাজনীতি পরিহার, সর্বোপরি ক্ষমতাসীন দলের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনকে নিজেদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করাই হবে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত।

উপসংহার:

উপরোক্ত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন বিধান যা গণতন্ত্রের সঠিক রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এর মাধ্যমেই বিশ্বে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। ইতিপূর্বে মানবসৃষ্ট গনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল ত্রুটিপূর্ণ। যদ্দরুণ কোনো দেশেই পূর্ণাঙ্গভাবে গণতন্ত্রের আদর্শ গৃহীত হয়নি। ফলে গণতন্ত্র এক পর্যায়ে স্বৈরতন্ত্রের রূপ গ্রহণ করে। কখনো কখনো তা গণতন্ত্রের আড়ালে একনায়কতন্ত্রের আদলে পরিচালিত হতে থাকে। আবার কোনো দেশে তা ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। ফলে তা দমনে গর্জে উঠে অত্যাচারিত জনগণ। তখনই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিশ্বনেতারা আদর্শের বুলি ছড়িয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে তাদের ইতিবাচক অবস্থানের জানান দেন। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকলের নীরবতা বিশ্ববাসীকে তাদের অবস্থানের ব্যাপারে সন্দিহান করে তুলে। এতে প্রত্যেক দেশের জনগণকে তাদের লড়াই একাই লড়ে যেতে হয়। অপরদিকে, ইসলাম প্রবর্তিত গণতন্ত্র কেবল প্রচারে নয় প্রয়োগেও তার শতভাগ কার্যকারিতা দেখিয়েছে। তাই নতুন ভাবে স্বাধীনতা অর্জনকারী প্রত্যেক দেশের নাগরিকদের উচিত ইসলামী গণতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। তবেই স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারবে দেশের আপামর জনগণ।

তথ্যসূত্রঃ

1. আল কুরআন।

2. হক, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল। ২০১৯। *পৌরনীতি ও সুশাসন* ঢাকা: হাসান বুক হাউস।
3. সাদ, এস.এম সাদি। ২০১০। *বাঙালির গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা (সম্পাদিত)*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ।
4. খান, ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, রহমান, শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান ও মোখলেছুর রহমান। ২০১৬।
5. *মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ* ঢাকা:উপমা প্রকাশন।
6. তাহের, মোঃ আবু তাহের। ২০০৯। *ইসলামে ধর্ম দর্শন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি* ঢাকা: কবির পাবলিকেশন্স।
7. হাসান, খন্দকার মাহমুদুল হাসান।২০১৬। *সভ্যতার বিকাশে ইসলাম*। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
8. আলী, স্যার সৈয়দ আমীর। ২০২৪। *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*। ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান অনূদিত। ঢাকা: ঝিনুক প্রকাশনী।
9. হুসাইন, মুহাম্মদ শাহাদাৎ হুসাইন। ২০১৭। *হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু) সংগ্রামী জীবন*। চট্টগ্রাম : জাগরণ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড প্রিন্টার্স।
10. হামিদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ। ২০০৫। *ইসলাম পরিচয়*। মুহাম্মদ লুতফুল হক অনূদিত। ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী।
11. হালিম, ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম। ২০১৭। খোলাফায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়াসাল্লাম। চট্টগ্রাম:আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন।
12. গণি, হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ওসমান। ২০২২। *সাহাবায়ে কিরামের জীবনী*। চট্টগ্রাম: চিশতী প্রকাশনী।
13. নদভী, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী। ২০১৯। *মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?* আবু সাইদ মুহাম্মদ ওমর আলী রহ. অনূদিত। ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা।
14. ইবনু কাসীর, হাফিয ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল। ২০২২। *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* । ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
15. রীয়াজ, আলী। ২০২৫। *আমিই রাষ্ট্র*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।
16. খতিব, ফিরাস আল খতিব। ২০২১। *লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি*। আলী আহমাদ মাবরুর অনূদিত। ঢাকা: প্রচ্ছদ প্রকাশন।
17. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Democracy_in_Bangladesh.
18. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Democracy_in_Bangladesh.
19. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Democracy_in_Bangladesh